প্রথম আলো

তারিখ 29 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষা ■ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ভবিষ্যৎ

ঘোষণাটি যদি এমন হতো যে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলুপ্ত হবে—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে ভাবছে, তাহলে বুঝতাম। ঠিক সেভাবে আসেনি, তবে যেভাবে এসেছে, এর মর্মার্থ ওরই কাছাকাছি। কলেজগুলোর অধিভুক্তির দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে, সে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হবে এ দায়িত্ব পালনকারী সাবেক চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে—রংপুর ও পটুয়াখালী(?)। অতঃপর কী কাজ হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের? উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়, এই নব পরিচয়ে নব উত্থান।

প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। তবে যতটা চমকপ্রদ, আশাপ্রদ নয় এর সিকি ভাগও।

প্রস্তাবটি অনেকটা এ ধরনের। একটি জনপদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি অতঃপর কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তার আবাসনকেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হবে। কারণ হাসপাতালটি ঠিকভাবে চলছে না। পত্তনকালে যে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হয়, সেটি দায়িত্ব পালনে সমর্থ নয়—এই অজুহাতে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হলে বা আদি উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজে ব্যবহার করা হলে, স্বভাবতই সে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত নয়, জানি। তবু সম্পূর্ণ স্মৃতিহীনতায় আক্রান্ত—এমন কথা শুনিনি। সবাই জানে, দেশের কলেজগুলো যত দিন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল—প্রথমে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তারপর ক্রমান্বয়ে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও শাহজালাল (?) বিশ্ববিদ্যালয়ের, তখন কলেজগুলোর প্রকৃত তত্ত্বাবধান করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না—এই ছিল শুধু অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারী একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের যুক্তি। কমিশনের রিপোর্টের অধ্যায় ১৩ : উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩.০৫ অংশের প্রতি সবার, বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'অনুমোদিত কলেজগুলোর সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সময় ও সুযোগের অভাব'-এর কথা বলে এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের সঙ্গে কলেজগুলোর শিক্ষাদানের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ' না থাকায় এই দ্বৈত ভূমিকা পালন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ক্ষতিকর এবং কলেজগুলোর জন্য অকার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছে—এ বিষয়ে একেবারেই নিশ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার দুর্বলতার [illegible] যুক্তিসিদ্ধ বিবরণ দিয়ে, [illegible] ১৩.৪৬—অংশে সিদ্ধান্ত দেয় : 'যে দিক থেকেই বিবেচনা করে দেখা যাক না কেন, দেশে চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যত সত্বর প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করা যায় ততই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মঙ্গল হবে।'

পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টে সরকারের পতন না হলে নিঃসন্দেহে আজ বাংলাদেশে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়, চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু অবস্থায় দেখতাম আমরা।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট হিমাগারে পাঠালেও আগস্ট ১৯৭৫-পরবর্তী সরকারও তার পছন্দমতো কমিশন গঠন করেছে। একাধিক কমিশন গঠিত হয়েছে। কোনো কমিশনই মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেনি। তবে ক্রমান্বয়ে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে, চার থেকে দুই এবং সবশেষে এক-এ। চার

থেকে এক-এ উন্নীত হয়ে, সেটিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে 'জাতীয়' বিশ্ববিদ্যালয় নামে। বিএনপি সরকার তাদেরই মনোনীত একজন যোগ্য উপাচার্য—আব্দুল মমিন চৌধুরীর যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলো—দলীয় চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে অপারগ এই উপাচার্যকে সরে গিয়ে স্থান করে দিতে হলো এমন এক ব্যক্তিকে, যাঁর দলীয় আনুগত্য নিয়ে দলের কোনো সন্দেহ ছিল না। এই প্রয়াত ব্যক্তিটির উল্লেখ না করতে পারলেই ভালো হতো, কিন্তু আজকের আলোচ্য বিষয়টি তাতে অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সে কারণে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দায়দায়িত্ব নিরূপণ করা এবং একে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল সরকারের দায়িত্ব। সরকার সে পথে না গিয়ে যে পথ অবলম্বনের কথা ভাবছে বলে সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেল, তাতে অবাক হয়েছি আমি। মূল উদ্দেশ্য যদি হয় কলেজভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ, তাহলে দয়া করে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের ওই অধ্যায়টি আবার পড়ুন। তাহলে দেখবেন, যে ব্যবস্থা অকার্যকর প্রতিপন্ন হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত হয়েছিল, সে ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন কোনোভাবেই ইপ্সিত ফল দিতে পারে না। আমার সন্দেহ, ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিও আবার সেই পুরোনো দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহী হবে না। না হওয়ার পেছনে বড় যুক্তি হবে, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ ব্যাহত হবে। একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়—পটুয়াখালী, আগ্রহ দেখিয়েছে এই বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণে, কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের পরিচয় কী, জানি না। যাদের অধিভুক্তি নিয়ে এত কথা, তারা নিজেরা কী চায়? তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কি না, প্রাপ্ত সংবাদে সেটা বোঝা গেল না।

সবশেষে আসি 'উৎকর্ষকেন্দ্র' দাবিদার প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। এটা স্পষ্ট নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার আরও একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কল্পনা করছে কি না। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আরও একটি ঢাকা-রাজশাহী-চট্টগ্রাম-সদৃশ টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি। তা যদি না হয়, তাহলে শুধু স্নাতকোত্তর-পরবর্তী কার্যক্রম-গবেষণা-পিএইচডি-এমফিলভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় কোনো দিন সেন্টার অব এক্সেলেন্স হতে পারবে না। সেটা কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য হবে না—বড় জোর একটি ইনস্টিটিউট হতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০-১১টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি, চট্টগ্রামে কয়েকটি ইনস্টিটিউট আছে। এর মধ্যে কয়টি সেন্টার অব এক্সেলেন্স হতে পেরেছে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? উৎকর্ষকেন্দ্র হওয়াটা ইচ্ছানির্ভর নয়, এটা মূলত সামর্থ্যনির্ভর একটা ধারণা।

সরকারের আশু কর্তব্য, চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধির, গুণগত স্বাস্থ্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। এর জন্য উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কমিশন দেশের, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ২০-২৫ জন যোগ্যতম গবেষক-অধ্যাপকের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে, দেশের জন্য জরুরি, উচ্চশিক্ষার জন্য জরুরি—সামর্থ্য বৃদ্ধির উপায়-পদ্ধতি বের করবে। যে প্রতিষ্ঠানের জন্মই হয়নি সেটা কারও ইচ্ছা বা স্বপ্ন পূরণে, একটি উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে দেখা দেবে, এই অলীক কল্পনার পথ পরিহার করা উচিত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নতুন উপাচার্য যোগ দিয়েছেন বলে শুনেছি। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে প্রশাসন লাভ করেছেন, সেটা অটুট রেখে তাঁর পক্ষে কত দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব জানি না। তিনি কীভাবে নিজের কর্তব্য স্থির করেছেন, তাও জানি না। তাঁর দায়িত্ব যদি তাঁকে পালন করার সুযোগ দেওয়া হয়, সেটা সুবিবেচনার কাজ হবে। তবে এ দায়িত্ব পালনে তাঁর যে সহায়তা প্রাপ্য, সরকারের কাছে, সেটা তাঁকে দিতে হবে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের যে মহাপরিকল্পনার কথা সংবাদপত্রে এসেছে, এতে তাঁর সংশ্লিষ্টতা কতটুকু, আমরা ঠাহর করতে পারছি না। তিনি কি একটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব পেয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পৌরোহিত্য করার জন্য, না সেই প্রতিষ্ঠানটিকে মৃত্যুর কিনার থেকে ফিরিয়ে পুনর্জীবন দানের জন্য? প্রশ্নটা আমি নিজেই করছি নিজের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ শূন্যের কোঠায়। সে জন্য একে নিয়ে না পারছি আশা প্রকাশ করতে, না পারছি হতাশা জানাতে। কিন্তু একটা জিনিস জানি—যে ভাবনা থেকে এর জন্ম, সে ভাবনাটা যত দিন আমাদের জন্য সত্য থাকবে—কলেজভিত্তিক উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু ও সংগত ব্যবস্থাপনা—তত দিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা আছে, আমরা বুঝি। আদমজী নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা ছিল। মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে সরকার সে ব্যথার শুশ্রূষা করেছিল। তবে এটা আদর্শ পন্থা নয়। মাথাটা রেখেই মাথাব্যথার নিদান খুঁজতে হবে। সরকার অনেক শ্বেতহস্তী পালন করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো শ্বেতহস্তী নয়, একটি পাওয়ানক প্রতিষ্ঠান। এর সমস্যা হলো ব্যবস্থাপনার। সেটা এমন কোনো সমস্যা নয়, যার সমাধান নেই। তবে কেউ যদি বলেন এর প্রয়োজন নেই, তাহলে কেন প্রয়োজন নেই কথাটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেশকে বলতে হবে, সবার আগে সংসদকে বলতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের পেছনে দেশের সব শিক্ষা কমিশনের সমর্থন আছে, তাকে কলমের খোঁচায় বদলে দেওয়ার নামে, শেষ করে দেওয়া ঠিক হবে না। এই পথে উচ্চশিক্ষার স্বার্থ রক্ষা হবে না।

● জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : শিক্ষাবিদ ; সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।